দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 SEP 1989
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩

092

# ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র সাথে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বলা হয়েছে, প্রত্যেককে এ নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কোন ছাত্র বা ছাত্রীর যদি স্থায়ী পরিচয়পত্র না থাকে তাহলে উপস্থিতমত বিভাগীয় চেয়ারম্যানের কাছ থেকে অস্থায়ী পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে নিতে হবে। নোটিসে আরও বলা হয় যে, প্রয়োজনবোধে কর্তৃপক্ষ যে-কারো দেহ তল্লাশি করতে পারবেন।

নোটিসটি সুখের নয়, এতে শিক্ষার করুণ পরিবেশ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের সাধনা ক্ষেত্র। সেখানে বুদ্ধির চর্চা থাকবে, যুক্তির প্রাধান্য থাকবে এবং চলাফেরায় কোন ভয়ভীতি থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক। এখানে কেউ কোন অস্ত্র বহন করছে কিনা, এর জন্য দেহ তল্লাশি করতে হবে, এ ভাবাও যায় না। এক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করার আগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দশবার চিন্তা করতে হতো। প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ না করে ভেতরে প্রবেশ করা যেতো না। আজ সবই পাল্টে গেছে। তুচ্ছতম ঘটনা উপলক্ষ করে সংঘটিত হচ্ছে রক্তারক্তি কাণ্ড। হাত-পা কাটাকাটি থেকে শুরু করে রোমহর্ষক খুন-খারাবি কিছুই বাদ যাচ্ছে না। সময় সময় ক্ষুদ্র-খণ্ড স্বার্থ ও সংকীর্ণতার পথ বেয়ে প্রবেশ করছে বহিরাগত দুর্বৃত্ত। কলুষিত হচ্ছে শিক্ষার পরিবেশ। রাত-বিরাত পরের কথা, দিন-দুপুরে চলা-ফেরা করতেও অনেক সময় গা ছমছম করে। ...ব প্রচেষ্টার পর গত দেড়-দু'বছর ...বং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ একটু একটু করে উন্নত হচ্ছিল। ...কিছু কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ...ইত হচ্ছিল স্বস্তির হাওয়া। ...লাগুলীর আওয়াজ আর ...বিচ-বল্লমের ছোটাছুটি কিছুটা ...পেয়েছিল। এখন আবার ...টি মাদ্রাসার ঘটনা উপলক্ষ করে ...ক হয়েছে ছাত্র-সংঘর্ষ। অশান্তি ...ং উপদ্রব। কত তুচ্ছতম কারণে ...বড় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, ঢাকা ...বিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলের গণ্ডগোল এর প্রমাণ। উক্ত হলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পোষ্টার লাগানোর জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড রয়েছে। শান্তি রক্ষার জন্যই সংশ্লিষ্ট মহল এ ব্যবস্থা নেন। জানা যায়, অধুনা একটি ছাত্র সংগঠনের পোষ্টার অন্য একটি ছাত্র সংগঠনের বোর্ডে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এ লাগানো ভুলে হতে পারে। আবার তারুণ্যের এডভেঞ্চারিজমের ফলও হতে পারে। যাই হোক, এর সুরাহা করা কঠিন ব্যাপার ছিল না। উভয়পক্ষ বসেই সমাধান করা যেত। পোষ্টার সরিয়ে ফেলা ছাড়াও ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে এ বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীদের কাছে এটাই ছিল প্রত্যাশিত।

এ-ই ছিল তাদের জন্য শোভন। এতটুকু শুভবুদ্ধি দ্বারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শাসিত হবে না, এ আশা করা যায় না। কিন্তু যা আশা করা যায় না, কার্যতঃ তাই ঘটে যায়। রক্তারক্তি কাণ্ড-কারখানার ভেতর দিয়ে দশ-বারজন ছাত্র আহত হয়। এ ছাড়া কয়েকটি কক্ষের বইপত্র পুড়ে ছারখার করে দেওয়া হয়।

বই-পত্র ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরা কিনে না। তাদের মা-বাবা কিনে দেয় এবং যে কিনে দেয় সে জানে, এর জন্য তাকে কত কষ্ট করতে হয়। বিসর্জন দিতে হয় কত সাধ। নিজের গায়ে না পড়লে মানুষ বহু কিছুই বুঝতে চায় না এটা ঠিক। তাই বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীও মা-বাবার কষ্ট বুঝবে না এ কি করে হয়! প্রকৃতই যখন তেমন ঘটনা ঘটতে থাকে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এদের উপর জাতি কতটা ভরসা করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এ চেতনার জাগরণ পরের কথা, গত ক'দিন যাবৎ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটছে। একের পর এক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত হচ্ছে হামলা, পাল্টা হামলা। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সব ঘটনা ঘটছে যা ভাবলেও গা শিউরে উঠে। যেমন হাত-পা কেটে ফেলা। কান কেটে নেওয়া। শিরা-উপশিরা কেটে পঙ্গু করে ফেলার চেষ্টা প্রভৃতি। ছাত্র সমাজ পরের কথা, সমাজের কোন স্তরের মানুষের কাছ থেকেই এহেন কাণ্ড প্রত্যাশিত নয়। কারণ এতে শুধু ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয় না, শুধু বিশেষ একজন ছাত্র খুন হয় না—খুন হয় সভ্যতা ও মানবতা। তাই এ ধরনের ঘটনা শংকা ও উদ্বেগের জন্ম দেয়। তা আরও এ কারণে যে, পশুশক্তি একবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে এর শেষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সুবিধা মত আজ একজন অন্যজনকে হামলা করবে। কাল অন্যজন করবে। দেখা যাবে, মানুষের সমাজ দিনে দিনে আরণ্যিক সমাজে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে ভবিষ্যৎ হচ্ছে অন্ধকার। কারণ, যেকোন কিছুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একটা পরিবার যত গরীব হোক সন্তান-সন্ততির পড়াশুনার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করে। যদি সম্ভব হয় পুরো একটা কক্ষ সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ঘরের এক কোণে আলাদা ব্যবস্থা করে। ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার সময় অন্য কথা বলার জন্য প্রয়োজন হলে ঘরের বাহিরে চলে যায়। এর মূল একটাই। ছেলে-মেয়েকে শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশে পড়ার সুযোগ দেওয়া। কারণ, হট্টগোলের মধ্যে পড়া হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ এমন যে, শুধু হট্টগোলপূর্ণ বললে নেহায়েত কম বলা হয়। বলতে হয় বিপজ্জনক। এর জন্য শুধু যে ছাত্ররাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট শূন্যতা। এ শূন্যতা জনসংখ্যা বা অন্যকিছুর নয়, জ্ঞান ও যোগ্যতার। বস্তুতঃ অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ যদি উন্নত না হয় তাহলে চলতি শতাব্দীর শেষে জ্ঞানী ও যোগ্য লোকের অনটন প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে। কারণ, আজ যারা ছাত্র, আট-দশ বছর পর তারাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে। দায়িত্ব নেবে নানা কাজের। তাই তাদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, শিক্ষা ছাড়া জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জিত হয় না। হানাহানির পরিবেশ এর অন্তরায় আর তাই শুধু ছাত্রদের নয়, জাতির স্বার্থেই এসব বন্ধ করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কাজটা এককভাবে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যদি হতো, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাতেই হয়ে যেত। কিন্তু তা হচ্ছে না বিভিন্ন মহলের অদৃশ্য কাজকর্মের ফলে। লোকচক্ষুর আড়ালে যেসব ঘটনা ঘটছে তা যদি বন্ধ না হয় তাহলে রক্তারক্তি দূর হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই শিক্ষা-প্রগতি এবং সভ্যতার খাতিরেই আমরা মনে করি, সব রকম সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারো এমন কিছু উস্কানি সৃষ্টি করা ঠিক নয়, যাতে পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠার সুযোগ পায়। সাথে সাথে ছাত্রদের যে শ্রেণীটি হাত কাটা ও পা কাটায় বীরত্ব খুঁজে পায়, তাদের মনে রাখা উচিত যে, অসুর শক্তি কারো একচেটিয়া নয়। তাছাড়া সময় চিরকাল এক পক্ষের জন্য অনুকূল বা প্রতিকূল থাকে না। সুতরাং সবচে' উত্তম হচ্ছে অসুর শক্তির অনুশীলন না করা; যুক্তিকে শক্তির উপরে প্রাধান্য দান।